কৃষিই সমৃদ্ধি

প্রশিক্ষণ সিডিউল ও প্রশিক্ষণ বার্তা

নভেম্বর/২০২৩

উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়
বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রশিক্ষণ সিডিউল- ০১

তারিখঃ ০৭ নভেম্বর, ২০২৩

সাপ্তাহিক কনফারেন্স ও প্রশিক্ষণ সেশনের রুপরেখা

সময়	বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১০.০০-১১.০০	গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন সংগ্রহ/ছকপত্র/নির্দেশনা প্রদান, বিগত/বর্তমানে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সংশোধন এবং অতন্দ্রজরিপ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা।	এইও/ এএইও/ এসএপিপিও
১১.০০-১১.৩০	বিভিন্ন প্রকল্প/বিশেষ কর্মসূচী/গুরুত্বপূর্ণ কাজের নির্দেশনা প্রদান, বিগত সপ্তাহের ট্র্যর নোট উপস্থাপন এবং প্রশিক্ষনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা।	ইউএও/ এইও
১১.৩০-১২.৩০ প্রথম ক্লাস	সরিষার আবাদ ও উৎপাদন কলাকৌশল	ইউএও
১২.৩০-১.০০ দ্বিতীয় ক্লাস	জৈব পদ্ধতিতে নিরাপদ সবজি উৎপাদন	এইও
১.০০-২.০০	নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি	
২.০০-২.৩০ তৃতীয় ক্লাস	সরিষার জাব পোকা দমন ব্যবস্থাপনা	এইও
২.৩০- ৩.০০ চতুর্থ ক্লাস	ধানের খোল পোড়া ও খোল পচা রোগ দমন ব্যবস্থাপনা	এসএপিপিও
৩.০০-৪.০০ পঞ্চম ক্লাস	ধানের বাদামী গাছ ফড়িং ও সবুজ পাতা ফড়িং দমন ব্যবস্থাপনা	এসএপিপিও

জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

উপজেলা কৃষি অফিসার
বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রশিক্ষণ সিডিউল- ০২

তারিখঃ ২১ নভেম্বর, ২০২৩

সাপ্তাহিক কনফারেন্স ও প্রশিক্ষণ সেশনের রুপরেখা

সময়	বিষয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১০.০০-১১.০০	গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন সংগ্রহ/ছকপত্র/নির্দেশনা প্রদান, বিগত/বর্তমানে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সংশোধন এবং অতন্দ্রজরিপ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা।	এইও/ এএইও/ এসএপিপিও
১১.০০-১১.৩০	বিভিন্ন প্রকল্প/বিশেষ কর্মসূচী/গুরুত্বপূর্ণ কাজের নির্দেশনা প্রদান, বিগত সপ্তাহের ট্র্যর নোট উপস্থাপন এবং প্রশিক্ষনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা।	ইউএও/ এইও
১১.৩০-১২.৩০ প্রথম ক্লাস	ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২৩	ইউএও
১২.৩০-১.০০ দ্বিতীয় ক্লাস	ভেজাল সার সনাক্তকরণ	এইও
১.০০-২.০০	নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি	
২.০০-২.৩০ তৃতীয় ক্লাস	ফুলকপির কাটুই পোকা দমন ব্যবস্থাপনা	এসএপিপিও
২.৩০-৩.০০ চতুর্থ ক্লাস	টমেটোর ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট রোগ দমন ব্যবস্থাপনা	এসএপিপিও
৩.০০-৪.০০ পঞ্চম ক্লাস	বোরোর আদর্শ বীজতলা প্রস্তুতকরণ	এইও

জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

উপজেলা কৃষি অফিসার
বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সরিষার আবাদ ও উৎপাদন কলাকৌশল

সরিষা বাংলাদেশের প্রধান ভোজ্য তেল ফসল। বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে এর চাষাবাদ করা হয় এবং প্রায় আড়াই লক্ষ টন তেল পাওয়া যায়। বিভিন্ন জাতরে সরিষার বীজে প্রায় ৪০-৪৪% তেল থাকে। খৈলে প্রায় ৪০% আমিষ থাকে। তাই খৈল গরু ও মহিষের জন্য খুব পুষ্টিকর খাদ্য।

বাংলাদেশে ৩ প্রকার সরিষার চাষ করা হয়। এ গুলো হলো-টরি, শ্বেত ও রাই।

সরিষার জাত

টরি-৭

ফসল বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ৭০-৮০ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্দতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ৯৫০-১১০০ কেজি হয়। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৮-৪১%। জাতটি রোগবালাই সহনশীল।

সোনালী সরিষা (এসএস-৭৫)

ফলে ৪ টি কক্ষ থাকে এবং প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ৩৫-৪৫ টি । বীজের রং হলদে সোনালী । বীজ গোলাকার।হাজার বীজের ওজন ৩.৫-৪.৫ গ্রাম এবং বীজে তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%। গাছের কান্ড ও শিকড় শক্ত বলে অধিক সার ও সেচ প্রয়োগে গাছ নুয়ে পড়ে না।

রাই-৫

প্রতি গাছে ৪-৬ টি প্রাথমিক শাখা থাকে। পাতা বোটাযুক্ত ও খসখসে। প্রস্ফুটিত ফুল কুড়ির নিচে অবস্থান করে।প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৯০-১২০। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৯-৪০%।

বারি সরিষা -৯

এ জাতটি টরি-৭ এর চেয়ে শতকরা ১০-২৫ ভাগ বোশ ফলন দেয়। আমন ধান কাটার পর এবং বোরো ধান চাষের আগে। স্বল্প মেয়াদী এ জাতটি সহজে চাষ করা সম্ভব। বীজে তেলের পরিমাণ শতকরা ৪৩-৪৪ ভাগ। ফসল পাকতে ৮০-৮৫ দিন সময় লাগে। পরিমাণমত সার ও সেচ দিলে হেক্টরে ১.২৫-১.৪৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

বারি সরিষা -১৪

হাজার বীজের ওজন ৩.৫-৩.৯ গ্রাম। ফসল ৭৫-৮০ দিনে পাকে। প্রতি হেক্টরে ১.৪-১.৬ টন ফলন পাওয়া যায়। আমন ধান কাটার পর স্বল্প মেয়াদী জাত হিসেবে চাষ করে বোরো ধান রোপণ করা যায়।

বারি সরিষা -১৭

হাজার বীজের ওজন ৩.০-৩.৪ গ্রাম। ফসল ৮২-৮৬ দিনে পাকে। প্রতি হেক্টরে ১.৭-১.৮ টন ফলন পাওয়া যায়। জাতটি স্বল্প মেয়াদী হওয়ায় রোপা আমন-সরিষা-বোরো ধান শস্য বিন্যাসের জন্য উপযুক্ত।

বিনাসরিষা-৪

হাজার বীজের ওজন ৩.৫০-৩.৮০ গ্রাম। বীজের রঙ লালচে কালো এবং বীজে তেলের পরিমাণ ৪৪% । জীবনকাল ৮০-৮৫ দিন। সর্বোচ্চ ২.৪০ টন /হেক্টর ফলন পাওয়া যায়। তবে হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১.৭০ টন।

বিনা সরিষা-৭

জাতটি খরা এবং অল্টারনারিয়া জনিত পাতা ও ফলের ঝলসানো রোগ সহনশীল। বীজের আকার তুলনামূলকভাবে বড় এবং ১০০০ বীজের ওজন ৩.৫০-৪.২৫ গ্রাম। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৬-৩৮%। জীবনকাল ১০২-১১০ দিন। হেক্টর প্রতি ফলন ২.০ টন।

বিনা সরিষা-৯

জাতটি অল্টারনারিয়া জনিত পাতা ও ফলের ঝলসানো রোগ এবং বৃষ্টিজনিত সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৩%। জীবনকাল ৮০-৮৪ দিন। হেক্টর প্রতি ফলন গড়ে ১.৬০ টন।

বপন পদ্ধতি:

সরিষা বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বপন করা হয়। লাইন করে বুনলে সার, সেচ ও নিড়ানী দিতে সুবিধা হয়। লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ১ ফুট রাখতে হয়। বপনের সময় জমিতে প্রয়োজনীয় রস থাকা দরকার।

বপনের সময়:

বিভিন্ন অঞ্চলের তারতম্য এবং জমির জো অবস্থা অনুযায়ী টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালী সরিষা, বারি সরিষা-৬, বারি সরিষা-৭ ও বারি সরিষা-৮ এর বীজ মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য কার্তিক মাস পর্যন্ত বোনা যায়। রাই-৫ এবং দৌলত কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে।

নিড়ানী দেয়া: বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর একবার এবং ফুল আসার সময় দ্বিতীয়বার নিড়ানি দিতে হয়।

সেচ প্রয়োগ: বীজ বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে (গাছে ফুল আসার সময়) প্রথম সেচ এবঙ ৫০-৫৫ দিসের মধ্যে (ফল ধরার সময়) দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে। বপনের সময় মাটিতে রস কম থাকলে চারা গজানোর ১০-১৫ দিনের মধ্যে একটি হালকা সেচ দিতে হয়।

পরিপক্বতার লক্ষণ

মাঠের তিন চতুর্থাংশ পাতা বিবর্ণ বা হলদে হলেই বুঝতে হবে সরিষা পরিপক্ব হয়েছে৷ এই অবস্থায় ফসল সংগ্রহ করতে হবে৷ গাছ বেশি পরিপক্ব হলে ফল ফেটে বীজ মাটিতে পড়ে যায়৷ টরি জাতীয় সরিষা ৭০-৯০ দিন এবং রাই জাতীয় সরিষা ৯০-১০০ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা যায়৷

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

সকালে ফসল তুলতে হয়৷ ফসল সংগ্রহের জন্যে গাছ শিকড়সহ টেনে তোলা বা কাঁচি দিয়ে গাছ মাটির সমানে কেটেও নেওয়া যায়৷ ফসল তুলে তা কয়েকদিন রোদে শুকিয়ে গরু বা লাঠি দিয়ে টিটিয়ে মাড়াই করতে হয়৷ গাছ পরিবহনের সুবিধার্থে ছোট ছোট আঁটি বেঁধে নেওয়া হয়৷ ফসল মাড়াই করার পর কয়েকদিন রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়৷ বীজের আদ্রতা ৬-৮% হলে তা সংরক্ষণের উপযুক্ত হয়৷

ফলন:

সরিষার ফলন জাত ও ব্যবস্থাপনাভেদে হেক্টরপ্রতি ৬০০-১৫০০ কেজি হতে পারে৷

ফসল সংরক্ষণ:

ফসল সংরক্ষণ করার পূর্বে খেয়াল রাখতে হবে যেন তাতে মাটির ঢেলা বা আবর্জনা না থাকে৷ বায়ুরুদ্ধ পাত্র বা পলিইথাইলিন লাইনিং করা বস্তায় সরিষা রাখা যায়৷ সরিষার পাত্র বা বস্তা ঠান্ডা বা শুষ্ক স্থানে রাখতে হবে৷

জৈব পদ্ধতিতে নিরাপদ সবজি উৎপাদন

উন্নত বিশ্বের প্রায় সব মানুষ এখন নিরাপদ সবজি বা অর্গানিক ভেজিটেবলের সন্ধান করছেন। বাংলাদেশেও এখন বিভিন্ন সুপার শপে অর্গানিক ভেজিটেবলের বিপণন শুরু হয়েছে। অর্গানিক ভেজিটেবল বা জৈব সবজির দামও অপেক্ষাকৃত বেশি। তবে আমাদের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশে আগে দরকার খাদ্য, বেশি পরিমাণে সবজি উৎপাদন। জৈব পদ্ধতিতে সবজি চাষে ফলন হয় কম। সেজন্য বাণিজ্যিকভাবে জৈব পদ্ধতিতে সবজি চাষ করলে তা আমাদের খাদ্য ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে না। সেক্ষেত্রে জৈব শাকসবজির দাম যদি কিছুটা বেশি পাওয়া যায় তাহলে অনেক কৃষক তা চাষে আগ্রহী হয়ে উঠবে। স্বল্প পরিসরে বিশেষ করে বসতবাড়িতে আমরা প্রত্যেকে অন্তত জৈব পদ্ধতিতে শাকসবজি উৎপাদন করে নিজেরা সেসব সবজি খাওয়া অভ্যাস করতে পারি। রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করে বাণিজ্যিকভিত্তিতেও জৈব পদ্ধতিতে শাকসবজি উৎপাদন করা সম্ভব।

জৈব পদ্ধতিতে সবজি চাষের ধারণা : রাসায়নিক সার, বালাইনাশক, আগাছানাশক, হরমোন ইত্যাদি বাদ দিয়ে ফসলচক্র, সবুজ সার, কম্পোস্ট, জৈবিক বালাই দমন এবং যান্ত্রিক চাষাবাদ ব্যবহার করে শাকসবজি চাষই হলো জৈব সবজি উৎপাদন। অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং কোনো রাসায়নিক দ্রব্য চাষ কাজে ব্যবহার করা হয় না। এতে ফসল দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না ও নিরাপদ শাকসবজি উৎপাদন অনেকটা নিশ্চিত হয়।

জৈব চাষাবাদের ইতিহাস : জৈব চাষাবাদের ধারণার উৎপত্তি আসলে আদিম। সুপ্রাচীন কাল থেকে এ পদ্ধতিতেই চাষাবাদ হয়ে আসছে। বিগত শতকে চাষাবাদে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়। রাসায়নিক সার ব্যবহার করে ষাটের দশকে সবুজ বিপ্লব ঘটিয়ে ফলন বাড়ানো হয়। ক্ষুধাময় বিশ্বে সে সময় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল এক বড় চ্যালেঞ্জ। সে প্রেক্ষিতে হয়ত সেটাই ঠিক ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের বোধোদয় হয় যে, রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে চাষের ফলে পেটের ক্ষুধা মিটছে ঠিকই কিন্তু পাশাপাশি এর ফলে মানুষের অসুস্থতা বাড়ছে। তাই ১৯৯০ সাল থেকে জৈব পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। জৈব পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় জৈব পদ্ধতিতে চাষকৃত এলাকাও বাড়তে থাকে। পৃথিবীর প্রায় ৩ কোটি ২২ লক্ষ হেক্টর জমিতে এখন জৈব পদ্ধতিতে ফসল চাষ হচ্ছে। এটা পৃথিবীর মোট আবাদি জমির ০.৮%। পাশাপাশি স্থানীয় জাতের জৈব পদ্ধতিতে আবাদ হয়েছে ৩ কোটি হেক্টরে।

১৯৩০ সালে জৈব কৃষির জন্য আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৩৯ সালে লর্ড নর্থবোর্ন তার লেখা খড়ড়শ ঃঃড় ঃঃযব খধহফ (১৯৪০) বইয়ে প্রথম ড়ৎমধহরপ ভধৎসরহম শব্দ ব্যবহার করেন। রাসায়নিক সারের উপর ক্রমেই কৃষকদের নির্ভরশীলতা বেড়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই আন্দোলন শুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম সুপার ফসফেট সার তৈরি শুরু হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অ্যামোনিয়া থেকে উদ্ভূত সারসমূহ তৈরি শুরু হয়। কম পরিমাণে ব্যবহার করতে হয়, তাড়াতাড়ি কাজ করে অর্থাৎ খুব শক্তিশালী, দামে সস্তা এবং পরিবহনে সুবিধা হওয়ায় রাসায়নিক সার দ্রুত জনপ্রিয়তা

লাভ করতে থাকে। অনুরূপভাবে ১৯৪০ সালের প্রথম দিকে রাসায়নিক বালাইনাশকের এমন অগ্রগতি ঘটে যে ওই দশকের শেষের দিকে রাসায়নিক বালাইনাশকের যুগ শুরু হয়। স্যার আলবার্ট হাওয়ার্ডকে জৈব কৃষির জনক বলে বিবেচনা করা হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে জে.আই.রডেল, যুক্তরাজ্যে লেডি ইভ বেলফোর এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরও অনেকে জৈব কৃষির ওপর কাজ করেন।

শুরু থেকে এ পর্যন্ত পৃথিবীর মোট কৃষি উৎপাদনের শতকরা খুব নগন্য অংশই জৈব পদ্ধতি ব্যবহার করে করা হয়েছে। পরিবেশ সচেতনতা এবং প্রয়োজন সাধারণ মানুষের কাছে জৈব কৃষির চাহিদা ক্রমেই বাড়িয়ে তুলছে। বাড়তি মূল্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি ভর্তুকি কৃষকদেরকে জৈব কৃষির প্রতি আকর্ষণ করছে। উন্নয়নশীল দেশে প্রথাগত চাষ পদ্ধতিকে জৈব পদ্ধতিতে চাষের সাথে তুলনা করা যেতে পারে কিন্তু তাদের প্রত্যয়নপত্র নেই। যাহোক ইউরোপে জৈব কৃষি পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি চোখে পড়ার মতো। আন্দোলন শুরুর মাধ্যমে জৈব কৃষি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির অনেক আগে থেকেই ভারতবর্ষে বেশ উন্নত জৈব পদ্ধতির চাষ হতো। ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থে জৈব কৃষির বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা আছে। ভারতে এখনও অনেক গ্রামে এসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। 'সঞ্জীবন' পদ্ধতি এরূপ একটি জৈব কৃষি পদ্ধতির উদাহরণ।

জৈব পদ্ধতিতে নিরাপদ সবজি উৎপাদনের প্রযুক্তি : কম খরচে কিভাবে জৈব পদ্ধতিতে নিরাপদ চাষ করা যায় সেটাই জৈব কৃষির প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কেননা, জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত পণ্যকেও বাজারে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। আবার স্বল্প উপকরণ ব্যবহারের ফলে তুলনামূলকভাবে উৎপাদনও কম হয়। তাই জৈব খামার ব্যবস্থাপনায় যাওয়ার আগে খামারে আয়-ব্যয়ের একটা হিসেব কষে ও বাজারে বিক্রির সুযোগ কোথায় কোথায় আছে তা করতে হবে। পাশাপাশি জৈব সবজি বা অর্গানিক ভেজিটেবল কেন ক্রেতারা কিনবেন সে বিষয়েও প্রচারণা চালাতে হবে। মানুষ যত বেশি স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতন হবে, তত বেশি জৈব সবজি কেনার দিকে ঝুঁকবে। জৈব সবজি চাষে যেসব প্রযুক্তি অনুসরণ করা যেতে পারে তা হল-

সবজির এমন কিছু জাত আছে যেগুলো কম উপকরণ ব্যবহার করলেও ভালো ফল দেয় ও রোগ-পোকার আক্রমণ কম হয়। বিশেষ করে স্থানীয় বা দেশি জাতগুলোর এরূপ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এরূপ জাত খুঁজে জৈব পদ্ধতিতে চাষ করতে হবে।

নেট হাউস তৈরি করে তার ভেতরে শাকসবজি চাষ করে কীটনাশক ছাড়াই অনেক পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার, সবুজ সার, খামারজাত সার ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।

বায়োফার্টিলাইজার (রাইজোবিয়াম, অ্যাজোটোব্যাকটার) ও বালাই দমনে বায়োএজেন্টসমূহকে (ট্রাইকোগ্রামা, ব্রাকন) ব্যবহার করতে হবে। বালাই দমনে বিভিন্ন গাছ-গাছড়া থেকে তৈরি করা বালাইনাশক ব্যবহারে উৎসাহিত হতে হবে। কিছু জৈব কীটনাশককে জৈব কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে যাদের নাম দেয়া হয়েছে 'গ্রিন পেস্টিসাইড'। যেমন- নিমবিসিডিন, নিমিন এবং স্পিনোসাড। সাধারণভাবে জৈব কীটনাশকসমূহ অজৈব কীটনাশকের চেয়ে কম বিষাক্ত এবং পরিবেশ বান্ধব। যে তিনটি প্রধান জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করা হয় তারা হলো- বি টি (একটি ব্যাক্টেরিয়াল টক্সিন), পাইরিথ্রাম এবং রোটেনন। অল্প বিষাক্ত জৈব বালাইনাশকসমূহের মধ্যে রয়েছে নিম, সাবান, রসুন, সাইট্রাস ওয়েল, ক্যাপসেসিন (বিতারক), বেসিলাস পোপিলা, বিউভেরিয়া বেসিয়ানা ইত্যাদি। বালাইনাশকের প্রতি পোকার প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠার আশঙ্কা থাকায় এসব জৈব বালাইনাশক পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা উচিত। এগুলোর পাশাপাশি- আগাছা দমনে কোন আগাছানাশক ব্যবহার না করে নিড়ানি ও হাত দিয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আন্তঃফসল ও মিশ্র ফসলের চাষ করতে হবে। শস্য বহুমুখীকরণ করতে হবে। হিসাব করে সবজির বপন বা রোপণ সময় আগাম বা নাবি করতে হবে। যুক্তিসঙ্গতভাবে সেচ ব্যবস্থাপনা করতে হবে। প্লাবন সেচ না দিয়ে ঝাঝরি দিয়ে বা কলসি ভরে পানি গাছের গোড়ায় ঢেলে সেচ দিতে হবে। প্রয়োজনে খরার সময় মালচিং করতে হবে। পরিণত হওয়ার সূচক মেনে অর্থাৎ উপযুক্ত সময়ে সবজি তুলতে হবে। শাকসবজি তোলার পর তা ধোয়া বা পরিষ্কার করার জন্য জীবাণুমুক্ত পানি ব্যবহার করতে হবে। বাছাই করে জীবাণুযুক্ত বা পচন ধরা শাকসবজি আলাদা করে বাদ দিয়ে প্যাকিং করতে হবে। প্যাকিং সামগ্রী জীবাণুমুক্ত হতে হবে। যতটা সম্ভব ক্ষেত থেকে শাকসবজি সংগ্রহের পর দ্রুত বাজারজাত করতে হবে। শাকসবজি খাওয়ার আগে জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার পানিতে ভালো করে ধুয়ে কাটতে হবে।

সরিষার জাব পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

লক্ষণ:

পূর্ণবয়স্ক ও বাচ্চা পোকা উভয়ই সরিষার পাতা, কান্ড, ফুল ও ফল হতে রস শোষণ করে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ফুল ও ফলের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং পাতা কুঁকড়ে যায়। জাব পোকা এক ধরনের রস নিঃসরণ করে, ফলে তাতে সুটিমোল্ড ছত্রাক জন্মে এবং আক্রান্ত অংশ কালো দেখায়। এজন্য ফল ঠিকমত বাড়তে পারে না, বীজ আকারে ছোট হয়। বীজে তেলের পরিমাণ কমে যায়। ফল ধারণ অবস্থায় বা তার আগে আক্রমণ হলে এবং প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে।

প্রতিকার:

১. আগাম চাষ আশ্বিনের শেষ ভাগ ও মধ্য-কার্তিক (অক্টোবর) অর্থাৎ আগাম সরিষা বপন করলে জাব পোকার আক্রমণের আশংকা কম থাকে।

২. প্রতি গাছে ৫০ টির বেশি পোকা থাকলে ম্যালাথিয়ন-৫৭ ইসি বা সুমিথিয়ন-৫৭ ইসি বা ফলিথিয়ন-৫৭ ইসি বা একোথিয়ন-৫৭ ইসি ডায়াজিনন ৬০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে বিকালে স্প্রে করতে হবে।

ধানের খোল পোড়া ও খোল পচা রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

রোগের নামঃ খোল পচা

রোগের বিস্তার

এ ছত্রাকের মাধ্যমে জীবাণু ধানের বীজ থেকে গাছ আবার গাছ থেকে পুনরায় বীজে ছড়াতে সক্ষম। প্রধানত আক্রান্ত গাছের বীজ থেকেই এ রোগের বিস্তার লাভ করে থাকে। তাছাড়া রোগাক্রান্ত খড় বিকল্প পোষক হিসেবে কাজ করে। মভজরা পোকা আক্রান্ত ক্ষতস্থানের মাধ্যমে এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। ভ্যাপসা গরম ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। গাছের থোড় অবস্থায় সব মৌসুমে এ রোগ দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ

- প্রথমে গাছের শীর্ষ পাতার খোল অর্থাৎ যে খোলে ধানের শীষ থাকে তার উপর গোলাকার বা অনিয়ত দাগ দেখা যায়। পরে দাগের কেন্দ্র ধূসর ও কিনারা বাদামি বা ধূসর হয়। ক্রমে দাগগুলো একত্রে মিলে বড় হয়ে সম্পূর্ণ খোলে ছড়াতে পারে।
- আক্রমণ বেশি হলে শীষ সম্পূর্ণ বের হতে পারে না। শীষ পেঁচিয়ে বা আংশিক বের হয়। শীষে খুব কম সংখ্যক দানা পুষ্ট হয়।
- অনেক সময় খোল পচা রোগে আক্রান্ত গাছে মাজরা পোকা আক্রমণের ক্ষত দেখা যায়।
- এ রোগ অন্য খোলেও হতে পারে তবে পাতায় হয় না।

দমন ব্যবস্থাপনা

- রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ বীজ ধানের জমি খোল পচা রোগ মুক্ত হতে হবে।
- পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- মিউরেট অব পটাশ (এমওপি) সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে এবং ইউরিয়া সার পরিমাণে কম ব্যবহার করতে হবে।
- জমির পানি শুকিয়ে পুনরায় সেচ দিতে হবে।
- কার্বেন্ডাজিম/প্রোভ্যাক্স ২০০ ডব্লিওপি ছত্রাক নাশক প্রতি কেজি বীজ ধানে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে শোধন করতে হবে।

- মাজরা পোকার ক্ষতস্থানের মাধ্যমে খোল পচা রোগের ছত্রাক বিস্তার লাভ করে তাই এ পোকা দমনের জন্য ডায়াজিনন ৬০ ইসি/কার্বোফুরান ৫ জি কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

রোগের নামঃ ধানের খোলপোড়া রোগ

রোগের লক্ষণ

- কুশি গজানোর সময় প্রথমে ছোট গোলকার বা লম্বাটে ধরনের ধূসর রঙের জলছাপের মত দাগ পড়ে এবং তা আস্তে আস্তে বড় হয়ে উপরের দিকে সমস্ত খোল ও পাতায় ছড়িয়ে পড়ে।
- দাগ গুলোর কেন্দ্রস্থল খয়েরী রং এবং পরিধি গাঢ় বাদামী রঙের হয়। এ অবস্থায় খোল দেখতে কিছুটা গোখড়া সাপের চামড়ার দাগের মত দেখায়।
- ইউরিয়া সার বেশি দিলে, আবহাওয়া গরম ও সেঁত-সেঁতে হলে এবং রোগ জীবাণু জমিতে থাকলে রোগ ছাড়ায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত ব্যবহার করতে হবে।
- ফসল কাঠার পর ক্ষেতের নাড়া পুড়ে ফেলা।
- সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করা এবং ইউরিয়া ২-৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করা।
- রোগ দেখা দিলে জমির পানি শুকিয়ে ৭-১০ দিন রাখার পর আবার সেচ দেয়া।
- চারা একটু দুরে লগানো। (২০/২০ সেমি।
- পটাশ সার ব্যবহার করা (প্রয়োজনে উপরি প্রয়োগ)
- প্রয়োজনে ছত্রাক নাশক ব্যবহার করা। প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি ফলিফুর, ১ মিলি প্রোপিাকেনাজল (টিল্ট ২৫০ ইসি) বা কনটাফ ৫ ইসি বা স্কোর, ১ গ্রাম কার্বেনডাজিম (ব্যাভিষ্টিন), নাটিভো ০.৪ গ্রাম নাস্টার ১মিলি, ওপাল ২.৫মিলি।

ধানের বাদামী গাছ ফড়িং ও সবুজ পাতা ফড়িং দমন ব্যবস্থাপনা

বাদামী গাছ ফড়িং (Brown Plant Hopper)

পরিচিতিঃ

- সবুজ ধানের অন্যতম শত্রু বাদামী গাছ ফড়িং। এটি কারেন্ট পোকা নামেও পরিচিত।
- এগুলোর গায়ের রঙ বাদামী বা গাঁড় বাদামী হয়ে থাকে। পূর্ণবয়স্ক পোকা লম্বা ও খাটো দু'ধরনের হয়ে থাকে।
- এগুলোর দেহ খুবই নরম এবং স্ত্রী পোকার পেট পুরুষ অপেক্ষা বেশি বড়। পূর্ণবয়স্ক পোকা ৩.৫ থেকে ৫.০ মিঃ মিঃ লম্বা হয়ে থাকে।
- লম্বা পাখা বিশিষ্ট পূর্ণবয়স্ক বাদামী ফড়িং গুলো প্রথমে ধান ক্ষেতে আক্রমণ করে। এরা পাতার খোলে এবং পাতার মধ্য শিরায় ডিম পাড়ে।
- ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে ৭ থেকে ৯ দিন সময় লাগে। বাচ্চা গুলো ৫ বার খোলস বদলায় এবং পূর্ণবয়স্ক ফড়িং এ পরিণত হতে ১৩ থেকে ১৫ দিন সময় নেয়।

ক্ষতির ধরণঃ

- ডিম ফুটে সাদা রঙের অতিক্ষুদ্র বাচ্চা বের হয়ে পাতার খোল থেকে রস খেয়ে বড় হতে থাকে।
- একজোড়া পোকা প্রতিবার প্রায় লক্ষাধিক পোকার জন্ম দিয়ে থাকে। এসব পোকা এক একরের বেশি জমির ফসল নষ্ট করে দিতে সক্ষম।
- এ পোকার সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, আক্রান্ত ক্ষেতে বাজ পড়ার মত হপারবার্ন এর সৃষ্টি হয়। দূর থেকে গাছ গুলোকে পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়। এ ধরনের ক্ষতিকে "হপার বার্ণ" বলে।
- একদিনে তাদের শরীরের ওজনের ১০-২০ গুণ খেতে পারে। অতিরিক্ত খাদ্য গাছের নিচের পাতায় মধু আকারে ঢেলে দেয়। পরে ঐ মধুতে ঝুল ছত্রাক জন্মে। এই ছত্রাক গাছের বৃদ্ধিতে বাধা দেয়।
- বাদামী গাছ ফড়িং গ্রাসি স্টান্ট, ব্যাগেট স্টান্ট ও উইল্টেড স্টান্ট নামক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

ক্ষতির ব্যপ্তিঃ

- সাধারণত বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এমনকি অনুকূল পরিবেশ পেলে এ পোকার আক্রমণে ক্ষেতে হপার বার্ণ সৃষ্টি হতে পারে, যার ফলে ১০০ ভাগ ফলনই ধ্বংস হয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- পোকার বংশবৃদ্ধি কম থাকতেই জৈবিক দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- আক্রান্ত জমির পানি ৭-৮ দিনের জন্য সরিয়ে ফেলতে হবে।
- আক্রমণ প্রবণ এলাকায় প্রতিরোধী জাত চাষ করা।
- ধান গাছ হাত দিয়ে ভাগ-ভাগ করে ফাঁকা করে আলো বাতাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া।
- আক্রান্ত জমিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ না করা।
- আক্রমণ প্রবণ এলাকায় ২৫ সেমি দূরে-দূরে চারা রোপন করতে হবে।
- সর্বোপরি আলোর ফাঁদ ব্যাবহার করে জমিতে হাঁস ছেড়ে দেওয়া, ক্ষেতে ডালপালা পুঁতে বা জমিতে উপকারী পোকার আক্রমণ বাড়ানো।
- আইসোপোকার্ব ৭৫ ডব্লিউপি (সপসিন/মিপসিন) ০.২ গ্রাম / লিটার পানি অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ২০ এসএল (ইমিটাফ/এডমায়ার/টিডো/এডক্লোপ) ০.৫মিলি/ লিটার পানি অথবা থায়ামেথোক্সাম ২৫ ডব্লিউজি (একতারা/কনফিডর/স্পইক) ০.২ গ্রাম / লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ধানের সবুজ পাতা ফড়িং (Green Leaf Hopper)

পরিচিতিঃ

- পূর্ণবয়স্ক সবুজ পাতা ফড়িং ৩-৫ মিলিমিটার লম্বা এবং গায়ে উজ্জল সবুজ রঙের সাথে বিভিন্ন কাল দাগ থাকে।
- এরা পাতার মধ্য শিরায় বা পাতার খোলে ডিম পাড়ে।
- এদের বাচ্চাগুলো পাঁচ বার খোলস বদলায় এবং এদের গায়ে বিভিন্ন ধরনের দাগ আছে।

ক্ষতির ধরণঃ

- পূর্ণবয়স্ক এবং নিম্ফ উভয় অবস্থায় এরা ক্ষতি করে।
- এরা কান্ডের রস চুষে খায়।
- এরা বেটে ধান, ক্ষণস্থায়ী হলদে রোগ, টুংরো ও হলুদ বাসন নামক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

ক্ষতির ব্যপ্তিঃ

- সবুজ পাতা ফড়িং সময়মত দমন করা না গেলে মারাত্মক ক্ষতিকর পোকা হয়ে উঠতে পারে। কেননা এ পোকা অনেকগুলি ভাইরাস রোগের বাহক। আর ভাইরাস রোগ একবার ছড়িয়ে পড়লে কোন ভাবেই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এজন্য এই পোকা দমন করা না গেলে সম্পূর্ণ ফসলই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

দমন ব্যবস্থাপনাঃ

- জমির আইল পরিস্কার রাখা, সঠিক দুরত্বে (সারি থেকে সারি ২০-২৫ সেমি ও গুছি থেকে গুছি ১৫-২০ সেমি) লাইনে চারা রোপন করতে হবে। ১০লাইন পরপর ১ লাইন ফাঁকা রাখতে হবে।
- পোকা আক্রান্ত জমির পানি সরিয়ে দিয়ে ৭-৮ দিন জমি শুকনা রাখতে হবে।
- ইউরিয়া সার ধাপে ধাপে ব্যবহার করতে হবে।
- নাড়া পুড়ে ফেলা ও আলোক ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।
- আক্রান্ত জমিতে ২-৩ হাত দূরে দূরে বিলিকেটে সুর্যের আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।
- জমিতে হাঁস ও হাঁসের বাচ্চা ছেড়ে পোকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- আইসোপোকার্ব ৭৫ ডব্লিউপি (সপসিন/মিপসিন) ০.২ গ্রাম / লিটার পানি অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড ২০ এসএল (ইমিটাফ/এডমায়ার/টিডো/ এডক্লোপ) ০.৫মিলি/ লিটার পানি অথবা থায়ামেথোক্সাম ২৫ ডব্লিউজি (একতারা/কনফিডর/স্পইক) ০.২ গ্রাম / লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২৩

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি কৃষি। দেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১১.৫২ শতাংশ। দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তায় এই খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি থেকে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য জোগান বর্তমানে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বন্যা, খরা, ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই ছাড়াও ইঁদুর প্রতিনিয়তই কৃষকের কষ্টার্জিত ফসল এর ব্যাপক ক্ষতি করছে। কৃষকসমাজ তাদের সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেখা যায় কৃষকের উৎপাদিত ফসলের একটি বড় অংশ ইঁদুর দ্বারা নষ্ট হয়। ইঁদুর মাঠ থেকে শুরু করে ফসল কর্তনের পরেও গুদামজাত অবস্থায় বা গোলায় তোলার পরেও ক্ষতি করে। ইঁদুর যে শুধু ফসলের ক্ষতি করে তা না মানুষেরও ব্যাপক ক্ষতি করে এবং রোগজীবাণুর বাহক হিসেবেও কাজ করে। এ ছাড়া সারাবিশ্বে বর্তমানে পোলট্্রির শিল্প ইঁদুর দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ১৯৮৩ সাল থেকেই" ইঁদুর নিধন অভিযান" পরিচালনার মাধ্যমে কৃষকদের ফসলের মাঠে সময়মতো ইঁদুর দমনে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। বাংলাদেশে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতি বছরই ইঁদুর নিধন কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে।

ইঁদুর খুব চতুরপ্রাণী। এই অনিষ্টকারী মেরুদ-ী প্রাণীটি ছোট হলেও ক্ষতির ব্যাপকতা অনেক। একটি ইঁদুর প্রতিদিন তার দেহের ওজনের ১০ ভাগ খাদ্য গ্রহণ করে। এরা যা খায় তার ৪/৫ গুণ নষ্ট করে। ইঁদুরের অনবরত কাটাকাটির অভ্যাস রয়েছে। এর সদা বর্ধিষ্ণু দাঁত রয়েছে, ক্ষয়ের মাধ্যমে দাঁতের এই বৃদ্ধিরোধ করার জন্য ইঁদুর সবসময় কাটাকাটি করে। এক গবেষণায় জানা যায় বাংলাদেশে ইঁদুর প্রায় ৫০-৫৪ লাখ লোকের এক বছরের খাবার নষ্ট করে। এরা যে শুধু কাটাকুটি করে আমাদের ক্ষতি করে তাই নয়, এরা মানুষ ও পশুপাখির মধ্যে প্লেগ, জন্ডিস, টাইফয়েড, চর্মরোগ, আমাশয়, জ্বর,কৃমিসহ প্রায় ৬০ প্রকার রোগ জীবাণুর বাহক ও বিস্তারকারী। ইঁদুর দ্বারা ফসলের ক্ষতি কমানো গেলে একদিকে যেমন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, অন্য দিকে তেমনি খাদ্যে মলমূত্র ও লোম সংমিশ্রণ বন্ধ করা গেলে স্বাস্থ্য, নিরাপদ খাদ্য এবং পুষ্টি নিশ্চিতের পাশাপাশি বিভিন্ন রোগের বিস্তারও কমে যাবে। ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ করা আপাত খুব কঠিন মনে হলেও সম্মিলিত ও সমন্বিতভাবে সঠিক কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে এদের সংখ্যা কার্যকরভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব।

ইঁদুর সর্বভুক ও নিশাচর প্রাণী, এরা যে কোন পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপখাইয়ে নিয়ে দ্রুত বংশবিস্তার করতে পারে। অনুকূল পরিবেশে এক জোড়া প্রাপ্তবয়স্ক ইঁদুর বছরে প্রায় ১৫০০-২০০০টি বংশধর সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রতিবারে ৪-১২টি বাচ্চার জন্ম দেয়। বাচ্চা প্রসবের ২ দিনের মধ্যেই স্ত্রী ইঁদুর পুনরায় গর্ভধারণ করতে পারে। বছরে প্রায় ৬-৮ বার বাচ্চা দেয়, ইঁদুরই একমাত্র প্রাণী যা যেকোন পরিস্থিতির আলোকে বাচ্চা জন্মদান বাড়াতে বা কমাতে সক্ষম। জন্মের ৪৫-৫০ দিনের মধ্যেই বাচ্চা ইঁদুর পূর্ণবয়স্ক হয়ে প্রজননে সক্ষমতা লাভ করে। দ্রুত বংশবিস্তারকারী স্তন্যপায়ী এ প্রাণীটি আমাদের বিভিন্ন মাঠ ফসলসহ বিভিন্ন ফল ও শাকসবজির মাঠে এবং গুদামে ব্যাপক ক্ষতি করছে। আমাদের বাসাবাড়ির বইপত্র, কাপড় চোপড় আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিসহ বিভিন্ন স্থাপনার ক্ষতি করছে। এর পাশাপাশি বাঁধ, রেললাইন, জাহাজ, বন্দর, অফিস, মাতৃসদন

সেচের নালাসহ সর্বত্র ইঁদুরের বিচরণ রয়েছে। ধান উৎপাদনকারী প্রতিটি দেশে কৃষক, চালকল মালিক ও ব্যবসায়ীরা ইঁদুরকে গুরুত্বপূর্ণ বালাই হিসেবে বিবেচনা করে। বিভিন্ন দেশে শুধু ধান কর্তন থেকে গুদামে রাখা অবস্থায় ২-২৫ ভাগ পর্যন্ত ইঁদুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বৃষ্টিনির্ভর ও সেচ সুবিধাযুক্ত ধানের জমিতে ফসল কাটার পূর্বে শতকরা ৫-১৭ ভাগ ক্ষতি হয়। বাংলাদেশে ইঁদুরের আক্রমণে বছরে আমন ধানের শতকরা ৫-৭ ভাগ, গমে ৪-১২ ভাগ, গোলআলুর ৫-৭ ভাগ, আনারসের ৬-৯ ভাগ নষ্ট করে। গড়ে মাঠ ফসলের ৫-৭% এবং গুদামজাত শস্য ৩-৫% ক্ষতি করে। এ ছাড়া ইঁদুর বর্তমানে পোলট্রি ফার্মে ছোট বাচ্চা ও ডিম খেয়ে ফার্মের মালিকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পোলট্রি শিল্পে ইঁদুর দ্বারা ক্ষতির দিকে লক্ষ রেখে মুরগীর খামারিদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং সমন্বিতভাবে ইঁদুর দমনে অংশগ্রহণ করতে হবে। কাজেই স্থানকাল পাত্রভেদে সঠিক কৌশলগত ও সমন্বিত দমন পদ্ধতি ব্যবহার করে ইঁদুর দমন করতে হবে এবং এর মাধ্যমে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি, ইঁদুর বাহিত রোগ ও পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমানো সম্ভব হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত পাঁচ বছরে ইঁদুর নিধন অভিযান কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে আমন ফসল রক্ষার পরিমাণ নিম্নেŔ দেয়া হলো : ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২২ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলাফল ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২৩ এর উদ্দেশ্য

* কৃষক, কৃষাণী, ছাত্রছাত্রী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আইপিএম/আইসিএম এসব ক্লাবের সদস্য, সিআইজি, ডিএই এর বিভিন্ন কৃষক দল, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোসহ সর্বস্তরের জনগণকে ইঁদুর দমনে উদ্বুদ্ধ করা;
* ইঁদুর দমনের জৈবিক ব্যবস্থাপনাসহ লাগসই প্রযুক্তি কৃষি কর্মীদের মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানো;
* ঘরবাড়ি, দোকানপাট, শিল্পকারখানা ও হাঁস-মুরগির খামার ইঁদুরমুক্ত রাখার জন্য সর্বস্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা;
* আমন ফসল ও অন্যান্য মাঠ ফসলে ইঁদুরের ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে রাখা;
* গভীর ও অগভীর নলকূপের সেচের নালার ইঁদুর মেরে পানির অপচয় রোধ করা;
* রাস্তাঘাট ও বাঁধের ইঁদুর নিধনের জন্য সর্বস্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা;
* ইঁদুরবাহিত রোগের বিস্তার রোধ করা এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা;
* সম্ভাব্য ক্ষেত্রে গণযোগাযোগ বিশেষ করে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যাপারে জোর দেয়া।

অভিযানের সময় ও উদ্বোধন

এক মাসব্যাপী ইঁদুর নিধন অভিযান সারাদেশে একযোগে পরিচালনা করা হয়। জাতীয়পর্যায়ে ইঁদুর নিধন অভিযান, ২০২৩ এর উদ্বোধনের পর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অঞ্চল, জেলা ও উপজেলাপর্যায়ে উদ্বোধন করা হবে। গত বছরের অভিযানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক ইঁদুর নিধনকারীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করা হবে। অঞ্চল, জেলাপর্যায়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট জেলার সংসদ সদস্য/চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ/জেলা পরিষদ/প্রশাসক/উপজেলা চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান/মেয়র অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি দ্বারা করতে হবে। উপজেলাপর্যায়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য/উপজেলা চেয়ারম্যান/তার মনোনীত প্রতিনিধি দ্বারা করতে হবে।

ইঁদুর নিধনে পুরস্কার প্রদান

জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযান ২০২২ বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পুরস্কার দেয়া হবে। অঞ্চলে অতিরিক্ত পরিচালকগণ নিজ অঞ্চলের পুরস্কার পাবারযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য যাচাই-বাছাইপূর্বক মনোনয়নের তালিকা সদর দপ্তরে প্রেরণ করেন। পরর্র্বর্তীতে সদর দপ্তরে প্রেরিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে জাতীয় ও অঞ্চলপর্যায়ের পুরস্কারের প্রাথমিক মনোনয়ন প্রদান করা হয় যা জাতীয় কমিটির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। জাতীয়পর্যায়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গত বছরের ইঁদুর নিধনকারীদের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে ০৫টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হবে। যারা পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন তাদের ক্রমানুসারে ১টি ক্রেস্ট, ১টি সনদপত্র ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নগদ অর্থ প্রদান করা হবে।

ইঁদুর জীব বৈচিত্র্যের অংশ হলেও আমাদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং নিরাপদ পরিবেশের জন্য এটি দমন অত্যন্ত জরুরি। ইঁদুরের সমস্যা দীর্ঘদিনের, এ সমস্যা পূর্বেও ছিল, বর্তমানেও রয়েছে। ইঁদুর দমন পদ্ধতি পোকা ও রোগবালাই দমন পদ্ধতির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ ইঁদুর অত্যন্ত চতুর এবং এখানে বিষটোপ ও ফাঁদ লাজুকতার সমস্যা রয়েছে। ইঁদুর সর্বদা খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য স্থান পরিবর্তন করে তাই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সঠিক পদ্ধতি, সঠিক স্থান ও সঠিক সময়ে একযোগে ইঁদুর নিধন করা প্রয়োজন। এককভাবে ইঁদুর নিধন করলে দমন ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও গণচীনে নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে এভাবে ইঁদুর নিধন করা হয়। ইঁদুর দমনের বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার জন্য এই পুস্তিকায় ইঁদুর দমন প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য সহজভাবে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে সংযোজন করা হয়েছে। ইঁদুর দমনের কলাকৌশল অধিক সংখ্যক কৃষকের নিকট পৌঁছানোর জন্য প্রত্যেক উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা তার ব্লকের কমপক্ষে ৬০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। একা ইঁদুর নিধন করার সাথে সাথে অন্যদেরও ইঁদুর নিধনে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। একা ইঁদুর নিধন করলে সাময়িকভাবে এ সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে, তবে অল্প কিছুদিন পরই আবার অন্যস্থানের ইঁদুর এসে সমস্যার সৃষ্টি করবে। কাজেই ফসল ও

সম্পদের ক্ষতিরোধ, জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও দূষণমুক্ত পরিবেশের স্বার্থে ইঁদুর সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে ক্ষেত-খামার, বসতবাড়িসহ সর্বত্র ইঁদুরের উপস্থিতি যাচাই করে ইঁদুর দমনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিতে হবে।

ভেজাল সার সনাক্তকরণ

অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাতের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হচ্ছে। তবে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সারে ভেজাল দ্রব্য মিশিয়ে নকল সার বা ভেজাল সার তৈরি ও বিক্রি করছেন। কৃষকভাইয়েরা একটু সতর্ক হলেই আসল সার ও ভেজাল সারের পার্থক্য বুঝতে পারবেন। এখানে কয়েকটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে আসল বা ভেজাল সার শনাক্ত করার উপায় সম্পর্কে জানানো হলো:

ইউরিয়া সার চেনার উপায়:

আসল ইউরিয়া সারের দানাগুলো সমান হয়। তাই কেনার সময় প্রথমেই দেখে নিতে হবে যে সারের দানাগুলো সমান কিনা। ইউরিয়া সারে কাঁচের গুড়া অথবা লবণ ভেজাল হিসাবে যোগ করা হয়। চা চামচে অল্প পরিমান ইউরিয়া সার নিয়ে তাপ দিলে এক মিনিটের মধ্যে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ তৈরি হয়ে সারটি গলে যাবে। যদি ঝাঁঝালো গন্ধ সহ গলে না যায়, তবে বুঝতে হবে সারটি ভেজাল।

টিএসপি সার চেনার উপায়:

টিএসপি সার পানিতে মিশালে সাথে সাথে গলবে না। আসল টিএসপি সার ৪ থেকে ৫ ঘন্টা পর পানির সাথে মিশবে। কিন্তু ভেজাল টিএসপি সার পানির সাথে মিশালে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গলে যাবে বা পানির সাথে মিশে যাবে।

ডিএপি সার চেনার উপায়:

ডিএপি সার চেনার জন্য চামচে অল্প পরিমান ডিএপি সার নিয়ে একটু গরম করলে এক মিনিটের মধ্যে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ হয়ে তা গলে যাবে। যদি না গলে তবে বুঝতে হবে সারটি সম্পূর্ণরুপে ভেজাল। আর যদি আংশিকভাবে গলে যায় তবে বুঝতে হবে সারটি আংশিক পরিমান ভেজাল আছে। এছাড়াও কিছু পরিমান ডিএপি সার হাতের মুঠোয় নিয়ে চুন যোগ করে ডলা দিলে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ বের হবে। যদি অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ বের না হয় তাহলে বুঝতে হবে সারটি ভেজাল।

এমওপি বা পটাশ সার চেনার উপায়:

পটাশ সারের সাথে ইটের গুড়া ভেজাল হিসাবে মিশিয়ে দেয়া হয়। গ্লাসে পানি নিয়ে তাতে এমওপি বা পটাশ সার মিশালে সার গলে যাবে। তবে ইট বা অন্য কিছু ভেজাল হিসাবে মিশানো থাকলে তা পানিতে গলে না গিয়ে গ্লাসের তলায় পড়ে থাকবে। তলানি দেখে সহজেই বুঝা যাবে সারটি আসল নাকি ভেজাল।

জিংক সালফেট সার চেনার উপায়:

জিংক সালফেট সারে ভেজাল হিসাবে পটাশিয়াম সালফেট মেশানো হয়। জিংক সালফেট সার চেনার জন্য এক চিলতে জিংক সালফেট হাতের তালুতে নিয়ে তার সাথে সমপরিমান পটাশিয়াম সালফেট নিয়ে ঘষলে ঠান্ডা মনে হবে এবং দইয়ের মতো গলে যাবে।

ফুলকপির কাটুই পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

পোকা চেনার উপায় : মথ মাঝারি আকারের ধুসর রঙের কালসে ছোপ ছোপ ডোরাকাটা। পাখায় হালকা ঝালরের মতো সুক্ষ পশম থাকে। পীঠ বরার লম্বা লম্বি হালকা ধূসর/ কালো চওড়া রেখা আছে। পুত্তলি গাঢ় বাদামি, কাটার মতো অঙ্গ থাকে।

ক্ষতির ধরণ : রাতের বেলা মাটি বরাবর চারার গোড়া কেটে দেয়। সকাল বেলা চারা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : গোঁড়া

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (কেয়ার ৫০ এসপি অথবা সানটাপ ৫০ এসপি ২০ মিলি / ৪ মূখ) অথবা ল্যামডা-সাইহ্যালোথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (ক্যারাটে ২.৫ ইসি অথবা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইসি ১৫ মিলি / ৩ মূখ) ১০ লিটার প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে, ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

টমেটোর ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট বা ঢলে পড়া রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

রোগের কারণঃ *Ralstonia solanaciarum*

লক্ষণঃ

- ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট একটি মাটিবাহিত রোগ।
- এ রোগের জীবাণু শিকড়ের ক্ষতস্থান দিয়ে গাছে প্রবেশ করে এবং পানি-পরিবহন নালীর মধ্যে বংশ বিস্তার করে নালী পথ বন্ধ করে দেয়। ফলে পাতা ও গাছ সবুজ অবস্থায় নেতিয়ে বা ঢলে পড়ে।
- এভাবে কয়েক দিনের মধ্যে সবুজ অবস্থাতেই গাছটি মরে যায়।
- রোগাক্রান্ত গাছের কান্ড মাটি থেকে ১-২ ইঞ্চি উপরে ছুরি দিয়ে কেটে পরিষ্কার কাঁচের গ্লাসের পানিতে রাখলে ২-৩ মিনট পরেই সাদা সূঁতার মতো পুঁজ বের হয়ে আসতে দেখা যায়। এ পদ্ধতিটি দ্বারা সহজেই এ রোগের জীবাণুকে সনাক্ত করা যায়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনাঃ

- রোগাক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র তুলে ধ্বংস করা।
- শস্য পর্যায়ক্রম করা যেমন ভুট্টা, সরিষা, গম।
- রোগ সহনশীল জাত চাষ করা।
- পরিমিত সেচ প্রদান। এ রোগ ধরে গেলে সেচ বন্ধ করা।
- বীজ ও চারা শোধন করা (স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন বা স্ট্রেপ্টোমাইসিন বা প্লান্টোমাইসিন ১ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করা যেতে পারে।
- হেক্টর প্রতি ৫ টন অর্ধপচা মুরগির বিষ্ঠা লাগানোর কমপক্ষে ২১ দিন আগে জমিতে প্রয়োগ করে মিশিয়ে দেয়া এবং মাটির সাথে ভালভাবে পচাতে হবে।
- সরিষার খৈল ৫০০ কেজি/হেক্টর হারে জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।
- ফুরাডান ৫ জি নামক কৃমিনাশক ২৫ কেজি/হেক্টর হারে চারা লাগানোর সময় অথবা জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করলে টমেটোর ঢলে পড়া রোগ এবং শিকড়ে গিঁট কৃমি বা রুট নট নেমাটোড স্বার্থক ভাবে দমন করা যায়।

বোরো ধানের আদর্শ বীজতলা

একটি বাচ্চাকে ছোট বেলায় যত্ন নিলে, পুষ্টিকর খাবার প্রদান এবং ভালো পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারলে, বড় হয়ে সে যেমন তার মেধার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাতে পারে, পরিবার,সমাজ ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করেত পারে; অর্থাৎ ছোটবেলার যত্নই তাকে বড় হয়ে সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সহায়তা করে। ঠিক তেমনি ধান ফসলেও কাংখিত ফলন পেতে বীজতলায় চারার যত্ন, সুষম খাবার ও উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা অতীব জরুরি। এই জন্যই ধানের জন্য আদর্শ বীজতলা তৈরি করা প্রয়োজন।

আদর্শ বীজতলা কি?

বেড আকারে তৈরি বীজতলা, যার প্রস্থ ১.২৫-১.৫০ মিটার এবং দৈর্ঘ্য ১০ মিটার কিংবা জমির দৈর্ঘ্য বরাবর লম্বা হতে পারে। যার দুই বেডের মাঝে ৫০ সেন্টিমিটার ফাঁকা থাকবে। ফাঁকা স্থানের মাটি পাশের দুই বেডে দিয়ে ১৫ সে.মি. গভীর নালা তৈরি করতে হবে এবং চারিদিকে আইল থেকে ২৫ সে.মি. ফাঁকা রেখে নালা তৈরি করতে হবে। এই নালার মাধ্যমে সেচ, নিষ্কাশন ও পরিচর্যা করা সহজ হবে।

তবে আদর্শ বীজতলায় বীজ ফেলার আগে আরো কিছু কাজ করতে হয়, যেমন.....

বীজতলায় বীজ হারঃ

প্রতি বর্গমিটার বীজতলায় ৮০-১০০ গ্রাম অংকুরিত বীজ বপণ করতে হয়। মোটা ধান হলে ১০০ গ্রাম এবং চিকন ধান হলে ৮০ গ্রাম বীজ লাগে। সেই হিসেবে প্রতি শতক বীজতলায় ০৩ কেজি এবং প্রতি কাঠায় ০৫ কেজি বীজ লাগবে। ০১ কাঠা বীজতলার চারা দিয়ে ০১ বিঘা জমি রোপণ করা যায়।

বীজ বাছাইঃ

বীজতলায় বীজ ফেলার পূর্বে অবশ্যই বীজ বাছাই ও শোধন করে নিতে হবে। বীজ বাছাইয়ের জন্য ১০ লিটার পানিতে ৩৭৫ গ্রাম ইউরিয়া সার ভালোভাবে মিশিয়ে ১০ কেজি বীজ ছেড়ে হাতদিয়ে নেড়েচেড়ে দিলে পুষ্ট বীজ নিচে জমা হবে এবং অপুষ্ট, হালকা বীজ ভেসে উঠবে। পুষ্ট বীজ বাছাই করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ০৩-০৪ বার ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।

বীজ শোধনঃ

প্রতি কেজি বীজের জন্য ২.৫-৩.০ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম বা কার্বক্সিল + থিরাম গ্রুপের ছত্রাকনাশক ০১ লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজের পোটলা ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর তুলে পরিষ্কার পানিতে আবার ০৬ ঘন্টা বীজের পোটলা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর পানি ঝেড়ে নিয়ে ২-৩ দিন জাগ দিতে হবে।

– বীজ অংকুরিত হবার পর বীজতলায় বীজ ফেলতে হবে।

– তারপর বীজতলায় চারার নিয়মিত যত্ন নিতে হবে। সেক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে.....

বীজতলার পরিচর্যা :

- বোরো ধানের বীজতলায় সবসময় নালা ভর্তি পানি রাখা উচিত।
- বোরো মৌসুমে শীতের জন্য চারার বাড়বাড়তি ব্যহত হয়, চারা হলুদ হয়ে যায় আস্তে আস্তে শুকিয়ে মারা যায়। এ কারণে শৈত প্রবাহের সময় বীজতলা সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। তখন বীজতলায় ৩-৫ সেন্টিমিটার পানি রাখতে হবে।
- সকালে রাতের পানি বের করে নতুন করে পানি দিতে হবে তার জন্য নলকূপের পানি প্রয়োগ করা সবচেয়ে ভালো।
- প্রতিদিন ভোর বেলায় কাঠি দিয়ে কুয়াশা ঝরিয়ে দিতে হবে।
- বীজতলার চারা গাছ হলদে হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম (প্রতি শতকে ২৮০ গ্রাম) করে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করলেই চলে।
- ইউরিয়া প্রয়োগের পর চারা সবুজ না হলে প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম (প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম) করে জিপসাম সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের সময় বীজতলায় ছিপছিপে পানি রাখা উচিত।

সতর্কতাঃ

চারা তোলার সময় অনেকেই আমরা চারা শিকড়ের মাটি ছড়ানোর জন্য একটি শক্ত কাঠির সাথে চারা কান্ড বা মাজায় বাড়ি দিয়ে থাকি। এইটা মোটেও করা যাবে না। কারণ এতে করে চারার মাজা ভেংগে যায় বা চারার মাজায় ছোট্ট ক্ষত (infection) সৃষ্টি হয়, যার ফলে ওই ক্ষত স্থান দিয়ে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে ক্রিসেক রোগ সৃষ্টি করে। ফলে চারা রোপণের পর, গড়া ও শিকড় পঁচে যায় এবং চারার বাড়, বাড়তি দেরিতে হয়।

জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

উপজেলা কৃষি অফিসার
বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া